দীর্ঘদিন বাদে দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী দেবরাজ সিংহরায়। উপলক্ষ অনেক দিন পর এ শহরে অনুষ্ঠিতব্য তার এগজিবিশন। একদিন এই শহর ছেড়েই সে পরাজিতের বেশে চলে গিয়েছিল। এখন সে নামজাদা শিল্পী। এতদিন পর পা রাখল কলকাতায়, বন্ধুদেরও যতটা সম্ভব জানাতে সে উদগ্রীব। তার মনে হয়, এবার একটা বড়সড় হল্লাগুল্লা হওয়া দরকার। দেদার পয়সা ওড়াবে, মদের ফোয়ারা ছোটাবে, প্রমত্ত উল্লাসে মাতবে, তবেই না তার কলকাতায় আসা সার্থক। দেখুক সবাই, দেবরাজ আর নগণ্য গ্রহ নেই, সে এখন রইস নক্ষত্র। ফোন হারিয়ে যাওয়ায় বন্ধুদের ফোন নম্বরগুলো অবশ্য তার কাছে নেই। একটা নম্বর অবশ্য তার মস্তিষ্কে গেঁথে আছে, কখনই সে ভোলে না। সেটা আঁচলের। তারপর.....

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

এই মোহ মায়া

পর্ব ২

খেতে বসেও মানসী আড়চোখে লক্ষ করছিল বড় মেয়েকে। এখনও ভারী দূরমনা হয়ে আছে মেয়ে। হাতে একখানা গল্পের বই, তবে পড়ছে না, দৃষ্টিই শুধু নিমগ্ন অক্ষরে। পড়লে কি চোখের মণি অমন স্থির থাকে?

দিদির উল্টোদিকের চেয়ারে অলি। বরাবরই। সে বকে বেশি, এখন কলেজে ওঠার পর মুখ যেন তার লাগামছাড়া। প্রতিটি দিন তার কাছে রোমাঞ্চকর, রাত্তিরের এই খাওয়ার টেবিল তার সারাদিনের অভিজ্ঞতা উজাড় করে দেওয়ার জায়গা। প্রসঙ্গের কোনও ঠিকঠিকানা থাকে না অলির। এই এক কথা বলছে, এই অন্য কিছু। এক এক সময়ে তো মাথা ঝিমঝিম করে মানসীর।

আজ অলি শোনাচ্ছিল পথে হঠাৎ মোবাইলের চার্জ ফুরিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান। কাকে যেন কল করার ভয়ংকর দরকার ছিল, পারছিল না...। আচমকা মাঝপথে প্রসঙ্গ ঘুরে গেল, ‘‘জানো বাপি, আজ কলেজে না একটা সাংঘাতিক মজার কাণ্ড হয়েছে।’’

শান্তনু ভাতে খোদলা করে ডাল ঢালছিল। সকালে ন’টার মধ্যে জলখাবার খেয়ে কারখানায় বেরিয়ে যায়, রাত্তিরটাই তার আয়েশ করে অন্নগ্রহণের সময়। এবং বাড়ির সবার সঙ্গে খানিক হাল্কা গল্পগাছা করার অবসরও বটে। মুচকি হেসে শান্তনু বলল, ‘‘কীরকম সাংঘাতিক? কালকের মতো?’’

‘‘কাল?’’ অলির চোখ পিটপিট, ‘‘কী হয়েছিল কাল?’’

‘‘ওই যে বলছিলি... একটা লোক নাকি বহুক্ষণ ধরে তোকে ফলো করছিল... বাসে... মেট্রোয়... কলেজেও পিছন পিছন ঢুকেছিল... শেষমেশ নাকি জানতে পারলি লোকটা তোদের কলেজের রিটায়ার্ড হেডক্লার্ক...’’

‘‘হ্যাঁ তো। ভদ্রলোক পেনশনের জন্য হাঁটাহাঁটি করছেন। কিন্তু আমি কী করে বুঝব বলো!’’

‘‘আজ বুঝি আরও সিরিয়াস। ব্যাপার?’’

‘‘একদম অন্য টাইপের কেস।’’ বাবার ব্যঙ্গ গায়েই মাখল না অলি। উচ্ছ্বাসভরা গলায় বলল, ‘‘আমাদের ক্লাসের দীপাঞ্জনটা না... হিহি হিহি।’’

‘‘আহা, কী হয়েছে বলবি তো?’’

‘‘রবিবার আমাদের সোশিওলজির রিইউনিয়ন আছে না... আমরা ফার্স্ট ইয়াররা হেব্‌বি একটা স্কিট নামাচ্ছি। স্কিট বোঝো তো? ওই যাকে বাংলায় বলে কী যেন... কী যেন...? অ্যাই দিদিভাই বল না?’’

আঁচল মুখ তুলল না। বুঝি শুনতেই পায়নি কথাটা।
অলি ফের খোঁচাল,"অ্যাই, স্কিটের বাংলাটা বলতে পারছিস না?"
"কৌতুক নকশা।" আঁচলের চোখ উঠতে উঠতেও নেমে গেল, "বা সংক্ষিপ্ত প্রহসন।"
"কী সন?"
"প্র-হ-স-ন।"
শব্দটা দু-তিন বার জিভে পাকাল অলি। তারপর বলল, "ওই আর কি। ব্যাপক ফানি। বীভৎস হাসির।"
মানসী মুখ বেঁকাল। উপমার কী ছিরি!
শান্তনু কিন্তু হেসেই চলেছে মিটিমিটি। বড় একটা গরাস মুখে তুলে বলল, "বীভৎস হাসিটা কীরকম? যাত্রাপার্টির ভিলেনদের মতন?"
"তুৎ, শোনই না...। স্কিটের একটা সিনে হিরো হিরোইন ফিফটি ফিফটি ঘনিষ্ঠ হয়ে ডায়ালগ বলবে..."
"ফিফটি ফিফটি ঘনিষ্ঠ?" শান্তনুর প্রায় বিষম খাওয়ার জোগাড়।
"ওফ বাপি, তুমি না গাঁইয়াই রয়ে গেলে।" অলি বিচিত্র মুখভঙ্গি করল, "মানে জাস্ট ফেস টু ফেস। কাঁধে হাত।"
"অ। তারপর?"
"তো হয়েছে কি, আশিতা দীপাঞ্জনকে যেই একটা ফাটাফাটি রোম্যান্টিক ডায়ালগ দিয়েছে, ওমনি দীপাঞ্জন..."
ব্যস, অলি ফের হেসে কুটিপাটি। মাথা ঝাঁকাচ্ছে পাগলের মতো।
রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মানসী বিরক্ত চোখে অলিকে দেখল। বড্ড ফাজিল হয়েছে মেয়েটা। সারাক্ষণ খালি হাহা হিহি।
থালায় কপি চচ্চড়ি নিতে নিতে বলল,"আহ অলি, হচ্ছেটা কী?"
"হিহি হিহি। দীপাঞ্জনটা তখন কী বলে উঠল জানো? অ্যাই ঈশ, কোন পেস্টে দাঁত মাজিস রে? তোর মুখে এত বদবু কেন?"
"ছিঃ, মেয়েটাকে ইন্সাল্টিং কমেন্ট করল, আর তুই কিনা...! তোকে বললে কেমন লাগত?"
"সাহস হবে বলার? এমন স্ক্রু টাইট দেব...। স্ট্রেট বলব, মাল্লু ছাড়, মাউথফ্রেশনার কিনে আনি।"
"শুনছ? মেয়ের কথা শুনছ?"
"না শুনে উপায় আছে?" শান্তনু ঘাড় হেলাল,"কী রে আঁচল, তোর কোনও কমেন্ট নেই যে?"
আঁচল যেন চমকে তাকিয়েছে। ফ্যালফ্যালে চোখে বলল, "কী বিষয়ে?"
"শুনলি না তুই...?"
"দিদিভাইকে এখন ডিসটার্ব কোরো না বাপি। ও এখন ধ্যানে আছে। সরি, পড়ছে। ...ওটা কী বই রে দিদিভাই? সেই তখন থেকে গিলছিস?"
ইংরিজি পেপারব্যাকখানা তুলে বোনকে দেখাল আঁচল। ঠোঁটে অপ্রতিভ হাসি। আবার নামিয়ে নিয়েছে চোখ। খুঁটছে রুটি। চিবোচ্ছে ধীর লয়ে।
মানসীর অস্বস্তিটা বাড়ছিল। খেতে বসে আঁচল কমই কথা বলে, তবে আজ যেন অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ। ওই বইয়ে মুখ গুঁজে থাকাটা যে এখন দৃষ্টিকটু লাগতে পারে, সে বোধটাও কি হারিয়ে ফেলেছে আঁচল?
নাহ, ওই হতচ্ছাড়া লোকটার ফোন আসাটাই কাল হয়েছে। মোবাইলে কী যেন গুজুর গুজুর হল, তারপর থেকেই মেয়ে ভাবের ঘোরে। শুধিয়েও তো লাভ হল না তেমন, ছাড়া ছাড়া উত্তর দিল।
কলকাতা এলেই কী যে উৎপাত শুরু করে লোকটা। কেমন যেন নেড়েঘেঁটে দেয় মেয়েটাকে। মাঝে ক'বছর এ শহরে পা মাড়ায়নি, মেয়েটা বেশ ছিল। এবার কী উপদ্রব বাধাবে কে জানে!
ওদিকে অলির মেলট্রেন ছুটছে সাঁ সাঁ। এক কহানি থেকে অন্য কিসসা, সেখান থেকে আর এক। সঙ্গে সঙ্গে চলছে হাত মুখ। কচকচ তিনখানা রুটি শেষ, লাফ দিয়ে বেসিন, পরক্ষণে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাস বসার ঘরে। উচ্চগ্রামে বেজে উঠল টিভি। নির্ঘাত কোনও রিয়্যালিটি শো আরম্ভ হচ্ছে।
কান পেতে একটুক্ষণ আওয়াজটা নিল শান্তনু। মুখের হাসিটা আর নেই। ভুরু কুঁচকে বলল,"অলি কখন পড়াশোনা করে বল তো? সারাক্ষণ তো হয় টিভি, নয় ফেসবুক খুলে বসে আছে, নয়তো কানে মোবাইল!"
"ঈশ্বর জানেন কখন পড়ে।" মানসী ঠোঁট উল্টোল, "বললেই তো মেয়ের বাঁধা জবাব, রেজাল্ট দেখে নিও!"
"হুঁঃ, পরীক্ষা তো উতরে দেয় প্রাইভেট টিউটররা। নোট গিলিয়ে গিলিয়ে। শান্তনুর মুখে ঈষৎ অপ্রসন্ন ভাব,"কেন যে অলিটার পড়ার অভ্যেস গ্রো করল না? দিদিকে দেখেও তো শিখতে পারত।"
পদে পদে দুই বোনের তুলনা করে শান্তনু। হয়তো বা সাদা

> "ওই যে বলছিলি... একটা লোক নাকি বহুক্ষণ ধরে তোকে ফলো করছিল... বাসে... মেট্রোয়... কলেজেও পিছন পিছন ঢুকেছিল...

মনেই করে, আর পাঁচটা বাবার মতো। প্রশংসা হয় আঁচলেরই, তবু কেন যেন মানসীর ভেতরটা খচখচ করে। এখনও। মনে হয়, আঁচলের সামনে আঁচলের গুণগান গাওয়ার মধ্যে বুঝি বা একফালি দূরত্বের আভাস লুকিয়ে আছে।
বিরস মুখে মানসী বলল,"চব্বিশ ঘণ্টা বইয়ে মুখ গুঁজে রাখাই বা কী এমন আহামরি হ্যাবিট?"
"ওইটে থাকলে অলি তরে যেত। লেখাপড়ায় সিরিয়াস হত।" বলতে বলতে শান্তনুর দৃষ্টি আঁচলে, "কী রে, তোর কী সমাচার? ছাত্রছাত্রীরা আজ ক্লাসে আওয়াজ টাওয়াজ দিয়েছে?"
"আজ তো কলেজ ছিল না বাপি।"
"ও হ্যাঁ, তোর তো সোম শুক্কুর। মাথায় থাকে না।"
শান্তনু আলগা হাসল,"তা তুই কি গেস্ট লেকচারারের চক্করেই আটকে থাকবি? রিসার্চ জয়েন করার কী হল?"
আঁচল বইটা মুড়ে রাখল। এক ঢোক জল খেয়ে বলল, "এগোচ্ছে।"
"অনেক গেঁতোমি হয়েছে, আর নয়। এবার উঠে পড়ে লাগ। তোদের তো আবার কী সব নতুন নিয়মকানুন হবে বলছিলি? পরীক্ষা না দিয়ে রিসার্চে নাকি ঢুকতেই পারবি না..."
"এখনও রুলটা চালু হয়নি। বোধহয় কামিং ইয়ার, কিংবা তার পরের বছর থেকে..."
"তাহলে দেরি করছিস কেন?"

"না না, কালই তো ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম। স্যার, মানে রথীন স্যারের সঙ্গে আলোচনাও হল। উনি কয়েকটা টপিক চুজ় করে নিয়ে যেতে বলেছেন।"
"ভেরি গুড। তোর তো মিডিভাল পিরিয়ড, কোনও একটা বংশ-টংশ ধরে কাজ শুরু করে দে, দাসবংশ, খিলজিবংশ, তুঘলক বংশ, কিংবা আকবর-টাকবর।"
"ও সব নিয়ে লাখো পেপার বেরিয়ে গেছে বাপি। আমি নতুন কিছু ধরতে চাই।"
"যেমন?"
"আমি একটা স্পেশাল চরিত্র নিয়ে ভাবছি। নূরজাহান।"
আঁচলের আনমনা ভাব কেটেছে অনেকটা। স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতেই বলছে কথা। মানসী সামান্য হালকা বোধ করল। কৌতুকের সুরে বলল, "নূরজাহান তো খুব দাপুটে মহিলা ছিল রে!"
"দাপট বলে দাপট!" শান্তনু মাথা দোলাল, "বাদশা জাহাঙ্গির পর্যন্ত তার কাছে কেঁচো হয়ে থাকত। আমির ওমরাহদের তুড়ি বাজিয়ে নাচাত।"
"ওই ফেজ়টা নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই বাপি। আমি ধরতে চাই, রাইজ অফ নূরজাহান। ফ্রম মেহেরউন্নিশ। নূরজাহানের ওই যে ক্ষমতার খিদে, সেটা এল কোত্থেকে!"
"ভেরি ইন্টারেস্টিং? হঠাৎ এটা মগজে এল যে?"
"অনেক দিন ধরেই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই যে, গত বছর পুজোর পর রানিগড় গিয়ে একদিন বর্ধমান টাউনে গেলাম... অম্বরদা আমায় শের আফগানের সমাধিটা দেখাল, তখন থেকেই নূরজাহান আমায় হন্ট করছে। ভাবো, কোত্থেকে কোথায় উঠেছিলেন মহিলা!"
"বটেই তো।" শান্তনু সায় দিল, "তা আইডিয়া যখন পেয়ে গেছিস, নেমে পড়।"
"দাঁড়াও, স্যারের মতটাও শুনি।"
আঁচল আলতো হাসল। আর কোনও বাক্য নেই, মাথা নামিয়ে শেষ করছে আহার। অলি থালা তোলে না কস্মিনকালে, টেবিল ছাড়ার সময়ে আঁচলই বোনেরটা নিয়ে গেল সিংকে। রান্নাঘরে খুটখাট করছে কী যেন। ওয়াটার পিউরিফায়ার চালাল। বাজনা বাজছে টুং টাং। টিভির প্রগলভ চিৎকারে চাপাও পড়ে গেল ধ্বনিটা। জগে জল ভরে টেবিলে রেখে গেল আঁচল। শান্তনুর ভোজন শেষ, আঁচাচ্ছে। মানসী পড়ে থাকা খাবারদাবারগুলো ঢাকা দিল। ফ্রিজে তুলতে গিয়েও থমকেছে, "আমি কিন্তু আর বাইরে কিছু রাখলাম না।"
"দাও ঢুকিয়ে।" ঘাড় বেঁকিয়ে দেওয়ালঘড়ি দেখল শান্তনু, "অম্বর ফিরলে দশ'টার মধ্যে চলে আসত। এখন তো পৌনে এগারো।"
"অম্বরের কিন্তু একটা ফোন করা উচিত ছিল।"
"বোধহয় মোবাইলে ব্যালান্স নেই। ব্যাটা পয়সা ভরেনি।"
"তুমি কি একটা রিং করবে?"
"করেছিলাম। সুইচড অফ বলছে।"
"আশ্চর্য, ও তো লোকাল বুথ-টুথ থেকেও..."
"অত বোধগম্যি থাকলে তো চিন্তাই ছিল না। টোটালি ক্যালাস।"
"জানোই যখন অকম্মা, তখন তাকে হরিনগর পাঠানো কেন?"
"এটা কি বলছ? শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গোনার জন্য তো আমি ওকে রানিগড় থেকে আনিনি। খাটুক একটু। নিদেনপক্ষে দৌড়োদৌড়িটা তো করুক।"
ওই দৌড়োদৌড়িই সার। কাকার কোনও উপকারে লাগবে না ওই ছেলে। কথাটা প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল, তবে বলল না মানসী। অম্বরের ওপর তার কণামাত্র আস্থা নেই। একে তো উড়ু উড়ু, দায়দায়িত্বের বালাই নেই, তার আবার কবিতা লেখার নেশা...।
শান্তনুদের হিসেবি পরিবারে এরকম একটা ভাবুক যে কী করে জন্মাল! অম্বরের বাবা তো চাষবাস জমিজমা ইউরিয়া ফসফেট ছাড়া কিসুই বোঝে না। শান্তনুর পরের ভাই বাংলার মাস্টার। তবে সেও সর্বক্ষণ সম্পত্তির ভাগ, নিজের প্রাপ্য, নিজের ছেলে-বউ আর টিউশনি নিয়ে মহা ব্যস্ত। আর সবার ছোটটি বিয়েশাদি করেনি বটে, জমিবাড়িতেও তার তেমন আসক্তি নেই, তবে সেও নিতান্তই অকবি। স্থানীয় রাজনীতিতে তার ভালই প্রভাব, ক্ষমতাদখলের কুটিল প্যাঁচপয়জারে সে মেতে থাকে দিনরাত।
ওই বংশের ছেলে হয়ে অম্বরের রক্তে কী করে যে বায়ুরোগ ঢোকে!
ঠাট্টার ছলে শান্তনুকে কথাটা দু-একবার শুনিয়েছে মানসী। দেখেছে, শান্তনু খুব একটা প্রীত হয় না। নিজের আত্মীয় পরিজন সম্পর্কে মানুষটা অদ্ভুত রকম স্পর্শকাতর। অথচ শান্তনু-মানসীর বিয়েটা একসময়ে রানিগড়ের কেউই মেনে নেয়নি। পাত্রী ডিভোর্সি জেনে শান্তনুর বাবা তো ছেলের মুখদর্শনেও রাজি ছিলেন না। তখন কিন্তু একটি ভাই দাদাও শান্তনুর পাশে দাঁড়ায়নি।
বাবার মৃত্যুর পর সম্পর্ক অনেক সহজ হয়েছে, তবু এখনও বছরে এক-দুপুরের বেশি রানিগড় মাড়ায় না শান্তনু। কিন্তু দুর্বলতাটা আছেই। নইলে দাদা ঠারেঠারে মনোবেদনা প্রকাশ করতেই তার নিষ্কর্মা পুত্তুরটিকে কাছে এনে পুষে রাখে?
শান্তনু দাঁতের ফাঁক থেকে খাবারের কুচি বার করছে। খড়কে করতে করতে উঠে গেল দোতলায়। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করবে। এ অঞ্চলে চোরের উপদ্রব বেড়েছে ইদানীং, তাই সতর্কতা। অম্বর থাকে ওপরে, সারাদিন কামরাটা খোলা পড়ে থাকে, সে ঘরেও তালা মারবে মনে হয়।
বাইরে হিম পড়ছে। বাতাসে শিরশিরে ভাব। রেল লাইনের এদিকটা এখনও ফাঁকা ফাঁকা, অল্প গাছপালাও আছে, তাই ঠাণ্ডাটাও বেশি।
মশাও খুব। বিকেল নামতে না নামতে বন্ধ করতে হয় দরজা জানলা। তাতেও নিস্তার নেই, সন্ধে থেকে মশকবিতাড়ন যন্ত্র জ্বালতে হয় ঘরে ঘরে। শীত পড়লে ভনাভনানি কমবে ক্রমশ, ততদিন জোরদার রাখতে হবে এই প্রতিরোধ।
নীচে নেমে শোওয়ার ঘরে এল শান্তনু। বসেছে কোণের চেয়ারটায়। টেবিলময় ফাইলপত্র। ব্যবসার। চোখে রিডিং গ্লাস চাপিয়ে চালু করল ল্যাপটপ। ডুবে যাচ্ছে কাজে।
মানসী পাতলা কম্বল বার করল। বালিশ মশারিও। জগ গ্লাস আগেই এনেছে। গলায় জল ঢালল খানিকটা। আয়নার সামনে বসেছে। শুকনো বাতাসে টান ধরছে চামড়ায়, তেলোয় ক্রিম নিয়ে ঘষছে গালে গলায় ঠোঁটে।
সহসা বসার ঘরে টিভির নিনাদ। প্রচণ্ড গুলিগোলার শব্দ, কে যেন কড়া গলায় শাসাচ্ছে কারওকে। অলি এবার সিনেমা চালিয়েছে!

শান্তনু বিরক্ত স্বরে বলল, "ওফ, এর মধ্যে কাজ করা যায়?"
মানসীরও অসহ্য লাগছিল। গলা ওঠাল, "অলি, ভলিউম কমাও।"
কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। মানসীর স্বর আরও চড়ল, "কী হচ্ছে অলি? কথা কানে যায় না?"
এবার অলি উঁকি দিয়েছে দরজায়, "ডাকছ?"
"বলছি, রাতদুপুরে কোন ভদ্র বাড়িতে এরকম গাঁক গাঁক টিভি চলে? এবার বন্ধ করো। শুতে যাও।"
অলি পরদা ধরে গা মোচড়াল, "আর পাঁচ মিনিট। এর পর একটা গান হবে, ওটা দেখেই..."
"এক মিনিটও নয়। তোমার দিদিটি কী করছেন?"
"ও তো লেপ্টে গেছে বিছানায়।"
"দয়া করে মশারিটা টাঙিয়ে নিও। কালও তোমাদের হুঁশ ছিল না, ভোঁস ভোঁস ঘুমোচ্ছিলে। যথেষ্ট ধাড়ি হয়েছ, রোজ বাপি গিয়ে তোমাদের মশারি টাঙিয়ে দিয়ে আসবে না।"
"বাপি তো এ ঘরেরটাও টাঙায় মা। তুমি কবে মশারি টাঙিয়েছ? হিহি হিহি।"
"মারব এক থাপ্পড়। যাহ।"
অলি পলকে উধাও। থেমেছে টিভির গর্জন। আহ, শান্তি। মানসী উঠে জানলার একটা পাল্লা খুলে দিল। অল্প করে। বেশি খুলতে সাহস হয় না, বন্ধ রাখতেও অস্বস্তি। জানলার ফাঁকটুকু দিয়ে কিছুই প্রায় দেখা যায় না, ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার ছাড়া, তবু তাকিয়ে আছে।
হঠাৎই শান্তনুর গলা, "আঁচল এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল?"
মানসী অস্ফুটে বলল, "হুঁ।"
"শরীর টরির ঠিক আছে তো? ওকে আজ কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছিল..."
মানসী অনুচ্চ স্বরে বলল, "লোকটা এসেছে যে।"
শান্তনুর ভুরুতে পলকা ভাঁজ, "কে লোকটা?"
"দেবরাজ সিংহরায়। আজ তিনি পা রেখেছেন কলকাতায়।"
"ও।" শান্তনু স্বাভাবিক স্বরে বলল, "আঁচলকে ফোন করেছিল বুঝি?"
"হুঁ। বিকেলে।"
ব্যস, আর কোনও জিজ্ঞাসা নেই, শান্তনু মাথা নামিয়ে কাজ করছে ল্যাপটপে। সত্যিই কি শান্তনু এত নির্বিকার? বুঝতে পারে না বলেই মানসী আচমকা রেগে গেল। ক্ষোভটা আছড়ে পড়ল দেবরাজের ওপর। খরখরে গলায় বলল, "আলগা পিরিত দেখলে গা জ্বলে যায়। সাতজন্মে মেয়ের খোঁজ নেয় না, এখানে এলেই দরদ উথলে ওঠে!"
"তা কেন। মাঝে মাঝেই তো দিল্লি থেকে ফোন করে।"
"কেন করে? কেন করবে? দরকারটা কী, অ্যাঁ? আঁচলের সঙ্গে ওর কিসের সম্পর্ক?"
"জানো না?"
"না। জানলেও মানি না। যে লোক বেলেল্লাপনা করার জন্য দু'বছরের মেয়ে ফেলে ভেগে যায়, তার কোনও ধরনের ন্যাকাপনা সাজে না। অনেককাল সহ্য করেছি, এখন আঁচল বড় হয়েছে, এবার ও সব বন্ধ হোক।"
"তা বললে চলে? আঁচলের ওপর তারও তো একটা রাইট আছে।"
"এক কণা নেই। আঁচল আমাদের মেয়ে। আমরা ওকে মানুষ করেছি।"
আমরা শব্দটার ওপর বাড়তি জোর দিল মানসী। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "কোনও দিন সে কোনও দায়িত্ব নিয়েছে মেয়ের?"
"দায়িত্ব না নিলে কি অধিকার মুছে যায়? নাকি দায়িত্ব গ্রহণ করলে বেশি রাইট এসে যায় হাতে?"
শান্তনুর স্বর একান্তই ভাবলেশহীন।
তবু যেন কোথাও একটা খোঁচাও আছে। আঁচলের বাবা হওয়ার একছত্র অধিকার সে অর্জন করতে পারেনি, এই রূঢ় বাস্তবটাই কি স্মরণ করিয়ে দিল মানসীকে?
অবশ্য শান্তনুর অভিমান অসঙ্গত নয়। আদিখ্যেতা কি দেবরাজের একতরফা? আঁচলেরও যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। অথচ শান্তনুর কাছ থেকে কী পায়নি ওই মেয়ে? সেই এতটুকু থেকে কোলেপিঠে করে বড় করল, অলি হওয়ার পরও তার আদর কমেনি বিন্দুমাত্র, অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না অলি আর আঁচলে কোনও বিভেদ রেখেছে শান্তনু। অলি তো তাও সময় সময় বাবার ধমক খায়, আঁচল তো কদাপি নয়। তার পরেও, যে তাকে অবহেলা ছাড়া কিছু দেয়নি, তার ফোন পেয়ে কেন উন্মনা হবে আঁচল?

শান্তনুর অভিমান অসঙ্গত নয়। আদিখ্যেতা কি দেবরাজের একতরফা? আঁচলেরও প্রশ্রয় আছে। শান্তনুর থেকে কী পায়নি ওই মেয়ে?

মানসী গুম হয়ে গেল। ড্রয়ার থেকে চিরুনি বের করে চেপে চেপে মাথা আঁচড়াচ্ছে। একগোছা চুল উঠল, চিরুনির দাঁড়া থেকে চেপে চেপে ছাড়াচ্ছে মরা চুল। নাকি মরা স্মৃতি, যা এখনও যথেষ্ট মরেনি? দু'যুগ আগের সেই লজ্জামাখা অপমানভরা দিনগুলো কি আদৌ মরবে কখনও?
তবু উঠে জানলার ফাঁকটুকু দিয়ে মরা চুলের গোছাটা থু থু করে ওড়াল মানসী। এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। হাল্কা কম্বলখানা টানল গায়ে। চোখ বুজেছে।
কিন্তু ঘুম আসে কই? বার বার মনে পড়ছে বিকেলের ছবিটা। ফোন পেয়ে পলকে উদ্ভাসিত আঁচলের মুখ। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পরই অস্বাভাবিক নীচু স্বরে দেবরাজের সঙ্গে আলাপচারিতা! মানসীর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ামাত্র দৃষ্টি সরিয়ে নিল আঁচল!
মানসী দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরল। আজও সকালে বনানী ফোন করেছিল। আঁচলের বিয়ের সম্বন্ধটা নিয়ে। শান্তনুকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। ভেবেছিল, কারখানা থেকে ফিরলেই বলবে শান্তনুকে। কিন্তু মেয়ে এমন মেজাজটা বিগড়ে দিল!
এখন কি বলা যায়? শান্তনুকে কি ডাকবে মানসী?

অলংকরণ: কুণাল বর্মন
ক্রমশ